সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের ছোটগল্পে নারীর জীবনযন্ত্রণা ও মুক্তির ইঙ্গিত

THE PEDICAMENTS FACED BY THE WOMEN AND HER JOURNEY TOWARDS FREEDOM IN THE SHORT STORIES OF SYED WALIULLAH

Saurabh Mandal

Ph.D Research scholar at Bankura University

সারাংশ –

নারীর অন্তর্লোকের গভীরে প্রবেশ করে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ নারী জগতের সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন। নারীরা আঘাতের পর আঘাত খেয়ে একসময় মুক্তি কামনা করে। তারা প্রতিবাদ করার ভাষাটুকুও হারিয়ে ফেলে, ফলে তাদের কখনো চোখের জল ঝরাতে হয়, কখনো-বা মৃত্যুর পথযাত্রী হতে হয়। এভাবেই তারা খুঁজে নেয় নির্মম মুক্তির পথ। কোন পুরুষ লেখকের কলমে এমন গল্প খুবই কমই দেখা যায়, যেখানে কোন মেয়ের ভাবনা জগত উপস্থিত করা হয় পুরুষ নিরপেক্ষভাবে, যেখানে সাংসারিক পরিস্থিতির বাইরেও মেয়ের অন্তর-জগত চিত্রিত হতে পারে, চিত্রিত হতে পারে তার শূন্যতার বোধ, তার স্বপ্ন, তার জীবনের ব্রতকথা। পুরুষ লেখক মেয়েদের প্রিয়া, জননী, জায়া, কন্যার ভূমিকাতেই দেখতে চায়, তাই তাদের কলমে মেয়েদের অন্তর্লোক পুরুষকেই কেন্দ্র করে বিবর্তিত হয়। কিন্তু সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ-র মানসকন্যা মালেকা কেবল একটুখানি সময় মাজুভাই-এর কথা ভাবে, যেটুকু ব্যতিক্রম মাত্র। মেয়েলি অন্তর্লোকের ছবি, তাদের দ্বন্দ্বময়তা এতটুকু বিশ্বাসযোগ্যতা হারায় না কোথাও। এখানেই গল্পকারের অনন্যতা। অন্তর্লোকের উপরই এই লেখকের ঝোঁক, কিন্তু বহির্লোকের ছবি যে একেবারে নেই, তাঁর গল্পে এমন নয়। তিনি অন্তর্লোকের অন্ধকারের থেকে উত্তরণের পথনির্দেশ দেন, কিন্তু সে অন্ধকারের বিশ্লেষণ ততটা চান নি। বহুবিবাহপ্রথা নারী মর্যাদার কোথায় আঘাত দেয়, সে বিষয়ে কিন্তু তাঁর লেখনী নীরব।

শব্দসূচক – দ্বন্দ্বময়তা, শূন্যতারবোধ, স্বপ্ন, অন্তর্লোক, মৃত্যুর পথযাত্রী, নারীমুক্তি।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের ছোটগল্পে নারীর জীবনযন্ত্রণা ও মুক্তির ইঙ্গিত

নারী কখনো জায়া, কখনো ভগিনী, কখনো জননী। সংসারে শত দুর্বিপাকে নানারূপে তারা এসে দাঁড়ায়, বিপন্ন জীবনের আশ্রয় হয়ে ওঠে। সেই নারীর লোকনিন্দাভীতি তীক্ষ্ণ, সমাজের অনুশাসন দ্বারা তারা নিয়ন্ত্রিত, কিন্তু সবাইকে ছাপিয়ে উঠেছে তাদের দুর্বল হৃদয়। পুরুষপ্রধান ,সমাজের নারীর অসহায়তা, জীবনযন্ত্রণা তাদের রক্তমাংসকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। কিন্তু সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর গল্পগ্রন্থে শুধুমাত্র নারীর জীবনযন্ত্রণার ছবিই তুলে ধরেন নি, তাদের মুক্তির ইঙ্গিতও দিয়েছেন।

মেয়েলি দুনিয়াতে নিষ্ঠুরতাই ডেকে আনে এক করূণ পরিণতি। হিংসা, বিদ্বেষ,অহংকার, ব্যঙ্গ — এসবই নারীর মানসজগতকে কুরে কুরে খায়। ' খণ্ড চাঁদের বক্রতায় ' গল্পে গণ্ডীবদ্ধ নারীর মনোজগতের ঈর্ষাজনিত অন্ধকারের দিকটি পরিস্ফুট করেই গল্পকার থেমে থাকেন নি, তার থেকে পরিত্রাণের ইঙ্গিতও দিয়েছেন। মেয়েলি মন ঈর্ষাতেই ঢাকা পড়ে যায়, বেরিয়ে আসে না তাদের আসল সত্তা, প্রতিবাদমুখী মানসিকতা, তাই কোন মৃত্যু বা আঘাত ছাড়া তারা কখনোই মুক্তি পায় না। এ গল্পে একদিকে অন্দরমহলের ভেতরে শেখ জব্বারের চতুর্থ বিবিকে তিনবিবি ঈর্ষার বাঁধনে বেঁধেছে, অন্যদিকে অন্দরমহলের বাইরে চলছে চতুর্থবিবির আগমন উপলক্ষে আনন্দ উৎসবে বিভিন্ন মানুষের প্রতিক্রিয়া। গল্পকার লিখেছেন —

' বাইরে আনন্দের আগুন জ্বলছে, এখানে জ্বলছে হিংসার আগুন। হিংসা-বিদ্বেষ এদের ধর্ম, এবং এরই উত্তাপে তারা বেঁচে থাকেঃ তাদের দেহে-তো সূর্যের আলো পৌঁছয় না। প্রত্যেকের ঠোঁটে কুটিল হাসি, সে-হাসির তলে জ্বালা, এবং এ-জ্বালা সঞ্জীবনী। ' শেখ জব্বারকেও ' ঘোড়েকা বাদশা ' বলে ব্যঙ্গ করেছে তারই দ্বিতীয়া বউ, সেটা প্রাপ্যও ছিল তার। চতুর্থ বিবি দীর্ঘক্ষণ ধরে ঈর্ষার শিকার হলে সে নিজেকে আর ধরে রাখতে না পেরে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে তৃতীয়া বিবির অনাবৃত বাহুতে সজোরে দাঁত বসিয়ে দেয়। ফলে তিনবিবিই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে ' হিংসার অনলে বিধ্বস্ত ' হয় সে। গণ্ডীবদ্ধতার আগুন মুসলনান মেয়েদের অন্তর্জগতে যে কতটা কলুষ ছড়ায় তার ইঙ্গিত দিতেও গল্পকার ভোলেন নি এখানে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ সমসাময়িক অনেক লেখকই হয়তো এখানেই গল্পের ইতি টানতেন — ' তাই এরা জিঞ্জির চায়, মুক্তি চায় না। '

' জিঞ্জির ' কথাটিফরাসী ' জন্-জীর ' থেকেএসেছে। এরঅর্থশিকলবাকারাবাস।এরপরেওগল্পকারনারীরঅন্ধকারদিকটিকাটিয়েমুক্তির পথদেখিয়েছেন।উৎসবচলাকালীনইশেখজব্বারেররক্তদীপ্ত বুকে তৃপ্তিহীন বাসনা জেগে উঠেছে। তাই সে ' চেঙ্গিস খাঁর দুর্বার লোলুপতা নিয়ে চতুর্থ বিবির কাছে যেতে চেয়েছে — " লাগুক, আজ দাঙ্গা লাগুক শতবার, রক্ত ফেলিয়ে উঠুক রাত্রির তমিস্রায়, এ-রাতকে হেলা করা চলে নাঃ উষ্ণ রক্তের সম্ভাষণ তাকে জানাতে হবে। " কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখে — " মহাকলরবের পর একি মহানীরবতা ! চিকে-ঘেরা অন্দরমহলে প্রগাঢ় স্তব্ধতা — মহারাত্রির মতো বিরাট শূন্য নীরবতা। সে-স্তব্ধতা নয়া বিবির চেতনাহীনতার স্তব্ধতা। " নতুন বিবির হতচেতন অবস্থা দেখে পয়লাবিবি ডুকরে কেঁদে বলল — ' এয়া খোদা, মেরি বেটিকী ক্যা হাল হুয়া ? চতুর্থ বিবিকে দেখে স্মৃতিতে অন্তর ভেসে উঠেছে তার মারা যাওয়া মেয়ের কথা — ' পয়লা বিবিরঅন্তর ঝিরঝির করে উঠল — অসার্থক ও অপূর্ণ মাতৃত্বের বেদনা ও স্মৃতির ভারে। ' এই স্মৃতি পূর্বে ঈর্ষার আগুনেপুড়ে গিয়েছিল, কিন্তু নিয়তি নয়া বিবিকে টেনে নিলে ঈর্ষা থেকে যেন মানবিকতায় ফিরে আসে পয়লা বিবির মন। গনি মিঞা গ্রামোফোনকে উপেক্ষা করে ভালোবাসার গান ধরেছে। সমাজের কুপ্রথাকে ভেঙ্গে নারীরাও মুক্ত হাওয়ায় নিজেকে মেলে ধরতে চায়, সুষ্ঠুভাবে জীবনযাপন করতে চায়, ভালোবাসাকে সঙ্গী করতে চায় —

' আকাশে হয়তো গুচ্ছ-গুচ্ছ আঙ্গুর ফল ঝুলছে, তার প্রত্যেকটি মহব্বতের রসে ভরা। কেন অত আঙ্গুর, কেনই-বা ঝুলছে ? — ঝুলছে শুধু নারীর দেহে ঝরঝর করে ঝরে পড়বার জন্যে। জয় হোক নারীর দেহের আর গুচ্ছ-গুচ্ছ আঙ্গুর ফলের, গনি মিঞাকে তোমরা সবাই বাহবা দাও, হাততালি দাও। '

' সতীন ' নামক অগ্রন্থিত গল্পটিতে একটি মেয়ের জীবনের করুণ কাহিনী বিশেষভাবে ধরা পড়েছে। সেই মেয়েটি হল হাফেজের প্রথমা স্ত্রী করিমন। হাফেজ ও করিমনের দাম্পত্য জীবনে দূরত্ব সৃষ্টির পিছনে কারণ হতে পারে — একদিকে হাফেজের সন্তানের প্রতি তীব্র ঘৃণা অথবা তার কৃপণতা, অন্যদিকে হাফেজের নারী লোলুপতা। করিমনের সহনশীল মন হাফেজকে এবং তার দ্বিতীয়া স্ত্রী অর্থাৎ তার সতীনকেও সহ্য করে আরে শান্ত, আরো স্নিগ্ধ হয়ে উঠল।

' ওঘরে এখন হাসছে তারা, হাফেজ হাসছে নিঃশব্দে, কিন্তু রেজিয়ার কণ্ঠ থেকে-থেকে ফেটে পড়ছে।পরশু দিনও যার গলা দিয়ে আওয়াজ বের হয় নি, তার গলা দিয়ে আজ ঝিলিক দিয়ে যেন উঠছে উলঙ্গ পুলক। '

করিমন রেজিয়াকে যত্নে রাখে, স্নেহ করে। তবুও হাফেজ নতুন বৌকে ঘিরে তার আত্মস্থতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, নিবিড় দরদ প্রকাশ করে থাকে তার প্রতি। করিমনের অর্ন্তজগতে সতীনের প্রতি ঈর্ষাও জাগে, সেটা তো অস্বাভাবিক কিছু নয়। আবার ঈর্ষার আড়ালে লুকিয়ে আছে তার মমতাবোধ, একদিকে সে সতীন হলেও, অন্যদিকে লুকিয়ে আছে তার মাতৃরূপী মন — ' বোন, অ বোন। ওঠ-গো বোন। ' এমন আদরভরা ভাষায় ডাকলেও নতুন বিবিকে স্পর্শ করতে পারে না করিমন, আর সেই ডাক শুনে মনে পড়ে যায় তার আগের বছর মারা যাওয়া বুবুর কথা। হঠাত্ একদিন রেজিয়া করিমনের কাছে এসে কেঁদে উঠলে সে তাকে বুকে নিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে থাকল। এখানেই ঈর্ষাবোধ থেকে উত্তীর্ণা করিমনের মানসলোকে জেগে উঠেছে মানবতাবোধ। করিমনের অন্তরে জমে থাকা জীবনযন্ত্রণা থেকে এভাবেই মুক্তির আভাস পাওয়া যায়।

দাম্পত্য জীবনে অধিক সন্তান-সন্ততি জন্মলাভ করলে একজন নারীর পক্ষে সত্যিই হাঁফ ছাড়বার ফুরসৎ পাওয়া যায় না। একজন ' হাঁটি হাঁটি পা-পা ' করতেই হঠাৎ ' ট্যাঁ করে চোখ-বোজা মাংসের পিণ্ড আরেকটি অতিথির আগমন ' হয়। এর জন্যে বিশেষ করে পুরুষই অধিক দায়ী।

' মৃত্যু ' গল্পেও ' ডিপুটি মুনসেফ ' খান সাহেব বদরুদ্দিনের স্ত্রী আমেনা খাতুন বহুসন্তানবতী হওয়ায় তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছে। একদিন হঠাৎ আমেনা খাতুন আনুভব করল — ' এলোপাতাড়ি দিশেহারা দিনগুলো কাটিয়ে এক শান্ত অপরাহ্নে পৌঁছে হঠাৎ তিনি যেন দুনিয়া আবিস্কার করলেন, তিনি নিজেকে খুঁজে পেলেন, বাঁচার প্রয়োজন ও জীবনের অর্থও যেন তাঁর কাছে প্রতিভাত হল মামুলি ধরনে। ' তাই খান সাহেব একদিন কালো রংচটা ছেঁড়া আচকান পরে কোর্ট অভিমুখে রওনা হবার সময় আমেনা খাতুন তাঁর মাথায় ' এক পাতিল ডাল ফেলে দিয়েছিলন ' । এই ঘটনা দেখে ছেলেমেয়েরা কেউ পরিহাস করে, কেউ নিজের প্রেমের সুযোগ খোঁজে, আবার তারা সবাই মায়ের চোখে দেখে ' হঠাৎ জ্বলে ওঠা উন্মত্ততার আগুন ' । এই ঘটনার প্রতিশোধ নিতে খান সাহেব — ' শেষে একদিন তিনি আমেনা খাতুনকে, যিনি তখন অধিক সংখ্যায় খোদার বান্দা পয়দায়েশ করে, নিজের বুকের রক্ত দিয়ে তাদের লালনপালন করে স্বয়ং নিজে মালখালাস ফতুর হয়ে আছেন, তাঁকে মোটর-টায়ারের অংশ দিয়ে তৈরি খড়ম দিয়ে বার-কয়েক আঘাত করলেন ' । একসময়ে রক্তশূন্য রোগা মানুষ আমোনা অসুখে পড়লো — ঘুষঘুষে জ্বর,

জিভে স্বাদ নেই, পেটে খিদে নেই। এক ছেলে তার পিতাকে মায়ের অসুখের কথা জানাতে এলে খানসাহেব গর্জে উঠে বললো — ' ও সব তোর মায়ের পেকনাই। পেকনাইটা বুঝলে না ছেলেটি ভালো করে। কেবল এ-কথা বুঝলে যে মায়ের চিকিত্সা হবে না, মরে মরুক ' । সুফিয়া হঠাৎ মায়ের ভক্ত হয়ে উঠেছে। তার মায়ের পায়ের কাছে বসে থেকে সেবা করছে তার মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা ভালোবাসার কথা ভুলে গিয়ে। আমেনা তার মেয়েকে এক একসময় গোপনে বলে — ' তোর বাপ আমার শরীরের রক্ত শুষে নিয়েছে বিন্দু বিন্দু করে। তার কারণ আমি সুন্দর না, আমি স্বাস্থ্যবতী নী ' । আবার আমেনা একদিন হঠাত্ অনুভব করলো মৃত্যুর পদধ্বনি। তাই তার স্বামীকে ডেকে পাঠালেও সে আসতে রাজী নয় বলে তার চোখ দুটো কেবল ক্ষণিকের জন্য ঝলসে উঠল এবং সে সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছল — ' বদরুদ্দিন সাহেব খুনী। শুধু খুনী। শুধু খুনী নয়, অকৃতজ্ঞ খুনী।..... মৃত্যুর মতো জ্বালাময়ী সর্বগ্রাসী একটা চক্রান্তের আগুন আমেনা খাতুনের সর্বাঙ্গ আবৃত করল ' । একদিন কিন্তু হঠাত্ খান সাহেব হুঁকোর নল নামিয়ে বৈঠকখানা থেকে সোজা বেরিয়ে গেল ডাক্তার ডাকতে শুধুমাত্র ভদ্রতার খতিরে, যে ডাক্তার বিনে পয়সায়তেই রোগী দেখে বেশী। ডাক্তার এলেও ডাক্তার দেখাতে রাজী নয় আমিনা, কারণ সে জীবনযন্ত্রণা মৃত্যুর মধ্যদিয়ে উপভোগ করতে চাইছে বিরূপ সংসার থেকে মুক্তি পাবার কারণে। জীবনের শেষ দৃষ্টিতে যে আলোটুকু তখনো অবশিষ্ট আছে তার জীবনে তা সার্থক করে তুলতে চাইল আমিনা — ' ছায়ার মতো – মূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে বসে আছে ছেলেমেয়েরা, আর বুকের পাশে মোটাসোটা বদরুদ্দিন সাহেব মাথা নত করে চুপ হয়ে আছেন ' । মৃত্যু যখন দরজায় কড়া নাড়ে তখন — ' সে-সর্বগ্রাসী আগুন কোথায় গেল, যে আগুনকে তাজিয়ে রাখবার জন্য চেষ্টা করেছেন দিনের পর দিন ?তাঁর অন্তর ঠাণ্ডা কোনো ক্রোধ নেই। ' এমনকি সে স্বামীর আপিসের ক্লান্তির কথাও স্মরণ করেছে মৃত্যু মুখে এসে। এটি মনে হয় একজন নারীর পক্ষেই সম্ভব। বরফ গলে গেলে যেমন জলে পরিণত হয় এ-নারী মনও সেরূপ। তারপরে একদিন আমিনা মারা গেলে এবং খান সাহেব নিঃসঙ্কোচে ' মৃতদেহের জন্য অর্থ ব্যয় করলেন। ফকিরও খাওয়ালেন অনেক। '

সংসারের ঘেরাটোপে থেকে নারীরা নিজের স্বাধীন অস্তিত্বটুকুও হারিয়ে ফেলে। মন খুলে কথা বলতে পারে না, মন খুলে হাসতে পারে না, অপরের শাসন মেনে চলতে হয় তাকে। অর্ন্তলোকের এই যন্ত্রণাও কাউকে বলে হালকা হবারও অধিকার নেই। ' বংশের জের ' গল্পে এই অবস্থার মধ্যে পড়ে আমিনা নামক মেয়েটি। আকাশে রামধনুর সাতটি রং দেখে পাশের বাড়ির ছেলেমেয়েরা

আনন্দে মেতে ওঠে, তবে আনিসা বাড়ির হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করলে তাকে শাস্তি পেতে হয়। গল্পকার বলেন — ' সে-দিন থেকে তাকে ঢুকতে হল শ্বাসরুদ্ধ-করা ঘেরাটোপে, আর পড়ল আদাড়ের জঞ্জালের পর্যায়ে। তাছাড়া চারধারে সকলের সদা সতর্ক দৃষ্টি। '

লাতুর ' ডাণ্ডা মারিয়া ঠাণ্ডা করিব কথায় খিলখিল করে হেসে উঠলেও তাকে গোরাবিবির কাছে ধমক খেতে হয় — তার চোখ নিষ্পলকভাবে নিবদ্ধ থাকে গোরাবিবির মুখের ওপর। হাসি শুনে গোরাবিবি থ হয়ে গিয়েছিলেন, এবার ধীরে-ধীরে মাথা নাড়েন। তারপর বলেন, - বেহায়ার মতো হাস কী করে ? '

আবার মাথার ঘোমটা কপাল থেকে তালুতে সরে গেলেও আনিসাকে ধমক খেতে হয়। তবুও সে মুখ বুজে সবকিছু সহ্য করে যায়। এমনকি তার স্বামী কমরও পাগল হওয়ায় জীবনে বেঁচে থাকাই দায় হয়ে ওঠে – ' তা গভীর রাতে পথভোলা হাটের লোকদের মতো মস্ত মাঠটার মধ্যে যদি ডাকাডাকি করতে থাকে এবং উত্তর দেবার লোক যদি না থাকে কেউ, তবে বউ আনিসা করবে কী ? '

এমনকি আনিসার সঙ্গে তার ভাই দেখা করতে এলেও একঝলক দেখা করারও অধিকার নেই তার। তাই সে লাতুকে কোলে নিয়েই ভাইয়ের গলার আওয়াজ শোনবার জন্যে অন্দরের উঠানে পায়চারি করে, তবুও গলার আওয়াজ শুনতে পায়নি সে সেখানে থেকে।

আনিসাও ভালোবাসা পেতে চায়, এবং সে একমাত্র দিদিশাশুড়ির কাছে সেই আশ্রয় পায়। দিদিশাশুড়ির জিজ্ঞেস করা কথা শুনে তার বুকের যন্ত্রণা জল হয়ে চোখ দিয়ে ঝিরঝির করে ঝরে পড়ে। তবে মাঝে মাঝে দিদিশাশুড়ির কাছেও তাকে ধমক খেতে হয়। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছিলেন ' ঘরের কাছে ঘরের মানুষের বলি ' , এ গল্প তারই দৃষ্টান্ত।

গণ্ডীবদ্ধ নারীদেরও স্বপ্নে ভরপুর জীবন, কিন্তু সাহস পায় না তারা নিজেদেরকে প্রকাশ করতে। ' স্বপ্নের অধ্যায় ' গল্পে মালেকা নিঃসঙ্গতার মধ্যেথেকেও স্বপ্ন দেখে। নীরব সংসারে মাজু-ভাই এর ' মাকা কেমন সুন্দর হয়েছে, না চাচি? ' এই কথা মালেকাকে ভাবতে শিখিয়েছে, শক্তি সঞ্চয়ের রসদ যুগিয়েছে। মাজুভাই একদিন তাদের বাড়ি থেকে চলে গেলেও ব্যাথা পায় নি সে। কারণ জীবনে দুঃখ সহ্য করে সমস্ত কিছু যেন সয়ে গেছে তার। কিন্তু — ' সারা মন কেবল আশ্চর্য শূন্যতায় শান্ত হয়ে রইল। '

একদিন মালেকা একটি বইতে নবাব আলিবর্দী খাঁর মেয়ে ঘসেটি বেগম ও আমিনা বেগমের মর্মান্তিক শোচচনীয় মৃত্যুর কথা পড়ে মানসিক আঘাত পায়।

কিন্তু রাতে সে জীবনের সত্যকে অনুসন্ধান করতে পেরেছে স্বপ্নের মধ্য দিয়ে— ' দেখল যে আমিনা বলছে, কী হবে বোন কেঁদে? একদিন মরতে হবেই, না-হয় আজই মরণ হল। '

কলকাতার কলেজে পড়তে এসে কয়েকদিন চাচার বাসায় থাকতে হওয়ায় মালেকা সেখানেও হাঁফিয়ে ওঠে। চাচার দুই মেয়ে রহিমা ও হোসেনাকে গৃহবন্দী হয়ে থাকতে হয়। তারা বাইরের আলো দেখার সুযোগও পায় না, কারণ স্বাধীনতার কামনাকে দমিয়ে রাখা হয় তাদের। তবুও আব্বা বাড়িতে না থাকলে তারা বাইরে চোখ মেলার সুযোগ পায় — ' সে-ফুটো দিয়ে ওরা তাকায় পাশের বাড়ির পানে, তাকিয়ে ক্ষুধার্তের মতো দেখে অন্যের মুক্ত জীবন। '

ভূতের মতো কালো পর্দার আবরণে নিজেদেরকে লুকিয়ে রাখাটা ভারী কষ্টের আবরণ হাস্যকরও বটে। মালেকা তা অনুভব করেছে এবং ভেবেছে – ' নিশ্চয়ই একদিন এ-কুসংস্কার কেটে যাবে এবং এদের নাতনি বা তারও এক-দুই পুরুষ পরের মেয়েরা এদের এ-প্রকার কথা পড়বে আর হাসবে ' । তাই বন্ধু নাজমাকে মালেকা তার স্বপ্নের কথা জানায়, জানায় একটি জাতির জাগরণের স্বপ্ন, নারীর ক্ষমতা অর্জনের স্বপ্ন – ' এসব যেন একটা জাতির স্বপ্ন, যে-জাতি নতুন জন্মেছে। মানুষের পুনর্জন্ম হয় না, কিন্তু জাতির হয়। আমরা মরে গিয়েছিলাম ভারতে, মিসরে,আরবে,আলবেনিয়াতে, পৃথিবীর সর্বত্র। আমরা হয়তো আবার নতুনভাবে জন্মলাভ করেছি, কিন্তু কেউ হয়তো সে কথা জানে না। ..... বিরাট বিশ্বজনীনতা যে রয়েছে আসল ইসলামের এ-শক্তিতে, —যে-শক্তি আজ ধ্বংস হয়ে গেছে। ..... কিন্তু তবু সত্য। এবং সে-সত্যের শক্তি নয় বটে তবে তার স্বপ্ন আমার মধ্যে ' ।

সেই স্বপ্নের মধ্যেই মালেকা সত্যের পথ, মুক্তির পথ খুঁজে পায়। মুখে সবকথা বলতে না পারলেও তাদের অন্তরে জমে থাকা কঠিন কথাগুলো খরস্রোতের মত বইছে — ' ঘরে তাদের বেশি কথা কওয়ার রেওয়াজ নেই, তাই অন্তরে হয়তো অনেক কথা জমে আছে বছরের পর বছর–স্তূপাকার হয়ে,যার সামান্য আজ অকস্মাৎ বেরিয়ে এল ' । সকল কুসংস্কারকে তুচ্ছ করে মালেকা নারীর জীবনের যন্ত্রণা থেকে মুক্তির পথে হাঁটতে চায়। ইসলাম ধর্মেরই জাগরণ চায় সে, কারণ সে জানে এই জাতির মুক্তিতে তাদেরও মুক্তি। মুসলিম মেয়েদের মধ্যেই কেন এত গোঁড়ামি ?— এই প্রশ্নই মনে হয় গল্পকারকে বারবার কুঠারঘাত করেছে। তাই মালেকার স্বপ্ন বাস্তবের রূপে ঝরে পড়ুক এই চান তিনি।

নকল গল্পে দেখানো হয়েছে আব্বার মুখ থেকে নীতিকথা শুনে আফিয়ার মনে হোত যে তার জীবনের সমস্ত রোদ্দুর যেন ঝলমল করছে — কোথাও বিচ্ছেদ নাই, নাই অন্ধকার — সদ্যা কিশোরীর যোগ্য স্বপ্নময় ছবি সব। কিন্তু পিতা প্রতাপী হওয়ায় আফিয়ার মনে নানা প্রশ্ন জাগলেও মনের ধূলার সঙ্গে মিশে যায় সে সব প্রশ্ন। দিনের পর দিন স্থির হয়ে বসে থেকে একদৃষ্টিতে পিতার চোখের দিকে, কখনো বা আকাশের দিকে চেয়ে থেকে আফিয়ার হৃদয় যেন অবশ হয়ে গেছে, ক্ষতে পরিণত হয়েছে। আফিয়ার আব্বা যখন বলেন — ' তখন আফিয়া শোনে, নীরবে, চুড়িতে পর্যন্ত সামান্য আওয়াজ হয় না। কথা যখন শেষ করেন তখনো আফিয়া নীরব থাকে, হয়তো তাঁর গভীর চোখের পানে চেয়ে, অথবা মেঝের পানে তাকিয়ে। তারপর ঘরে নীরবতা জমাট হয়ে ওঠে এত নীরবতা যে আফিয়া তলিয়ে যায়, আর তার মধ্যে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো আব্বার বলা কথাগুলো বারেবারে কানে এসে লাগে। তারপর একসময় তিনি আস্তে বলেন, যাও। শুনে সে আস্তে উঠে দাঁড়ায়, নীরবে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে ' ।

মনের গভীরে ডুব দিয়ে সর্বদাই দ্বন্দ্বে অবতীর্ণা আফিয়া। সে জানতে চেয়েছে যে তার আব্বা নীতিবোধ নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়, না কন্যার ভালোবাসাকে ঘিরে – ' অশ্রুকে আব্বা কোনোদিন বেশি আমল দেন না, কাজেই ওর মোছামুছির ব্যাপারে তিনি বরাবর নিরুৎসাহ। তাছাড়া বাইরের চোখের পানির সম্বন্ধে সজ্ঞান করে না দিয়ে বরঞ্চ ভেতরের আসল সত্তাকে টেনে আনেন বাইরে ' ।

তাই দিন বয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কন্যা ও পিতার মধ্যে মনের দূরত্ব বেড়েছে — সেটা হয়তো দুজনেই টের পেয়েছিল পূর্বেই। এই সংসারের শান্তমুখর পরিবেশে যেন একটা ঝড় বয়ে যাচ্ছে। আফিয়ার মনে প্রতিবাদ জাগে, ,সেই নীরবতার জাল ছিঁড়ে ফেলতে চায় সে। নিজের মনে তার প্রশ্ন জাগে — ' সে যে আব্বার কথা মন দিয়ে শুনেছে, শুনে তার কেমন ভালো লেগেছে, এ-কথা জানাবার কি আর অধিকার নেই? আরো কিছুক্ষণ বসে আরো কিছু জানবার, শোনবার দাবি কি তার নেই ? কিন্তু এ পরিবারের আত্মসচেতন হবার যেমন উপায় নেই, তেমনি অভিমানকেও প্রাধান্য দেয়া যায় না।

আাফিয়ার আব্বো বলেন ইসলামের কথা — মুসলমানদের আজ চরিত্র নেই, মেরুদণ্ড নেইঃ আলজিয়ার্স থেকে জাভা-সুমাত্রা-চীন পর্যন্ত কোথাও নেই। হয়তো এখানে-সেখানে ব্যতিক্রম হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে আছে, কিন্তু জাতি হিসাবে নেই। তবে আবার হবে, হবে ধীরে-ধীরে।

এসব কথা আফিয়া নীরবেই শোনে। আবার মনে পড়ে বেগম রোকেয়ার কথা যিনি লিখেছিলেন, ধর্মগ্রন্থগুলিই মেয়েদের পরাধীনতার মূলে। লিখেছিলেন মুনিঋষিরা পুরুষ ছিলেন বলে মেয়েদের জন্য অধীনতামূলক বিধান রচনা করেছেন, কোনো স্ত্রী-মুনি বিধান দিলে হয়তো অন্যরকম শোনা যেত।

নিঃসঙ্গময় জীবনে আাফিয়ার মনে গুমরে থাকা প্রতিবাদ একদিন ঝলসে উঠেছে তারই মামাতো ভাই মোনায়েমকে কেন্দ্র করে। মোনায়েনেরও সেই সংসাররের আবহ ভালো লাগে না। সে গরীব বলে তাকে বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছে আফিয়ার আব্বা। তার জন্য খোঁটা না দিলেও ভালো বাসার সম্পর্কে তাকে বাঁধতে পারে নি। কারণ সেই সংসার বৃত্তেই তো নেই হৃদয়ের স্পর্শ। তাই অন্ধকার ঘনিয়ে আসে সেই পরিবারে, তারই ছাপ পড়ে আফিয়ার চোখে মুখে। মোনায়েম তাকে ' নকল ' বলেছেবলেই তার উত্তর খুঁজতে চেয়েছে সে তার পিতার কাছে। এর উত্তরে আফিয়ার আব্বা জানিয়েছে — ' আমি যে-শিক্ষা পেয়েছি, তোমাকে আমি যে-পরিবেশে দিয়েছি, তা নকল। ...... আমাদের কিছু নেই, যা-ও-বা আছে তা নকল। যা আছে তা-নিয়ে পুতুলখেলা চলে, কিন্তু জীবন্ত কিছু চলে না ' ।

এরপরে আফিয়ার হৃদয়ের শব্দহীন ধ্বনি আর শোনার থাকে না। অন্ততঃ সে পিতার কাছে নিজ প্রশ্নের উত্তর জানতে পেরে আত্মযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছে।

নারী আশ্রয় খোঁজে, চায় ভালোবাসার মানুষকে আাপন করে পেতে। ভালোবাসা মানুষকে মন থেকে [illegible] আর [illegible] - এর দ্বন্দ্বও দূরে ঠেলে দেয়। [illegible]দিনের এক দ্বিপ্রহরে গল্পে ছালেহা আানোয়ারকে ভালোবাসে তাই বারবার সে ছুটে আসে তার কাছে। কিন্তু আনোয়াররের কাছে ছালেহার চেয়ে ইসলাম ধর্ম বেশি প্রাধান্য পায়। মুসলিমদের দুরাবস্থা সহ্য করতে পারে না সে — ' সত্যিই তারা অসহায়, শক্তিহীন, মূক প্রাণীর দল, না-হলে, মানুষ হয়ে– আর দশজনের মতো রক্তমাংসের মানুষ হয়ে কী করে তারা এই নিষ্ঠুর অত্যাচার ও নিপীড়ন নীরবে সহ্য করতে পারলে ? ...... ছালেহা, তাই গাঁয়ে গিয়ে আমি থাকতে পারি না, আমার সারাদেহে সারাক্ষণ কে যেন চাবুক মারতে থাকে। অসহ্য ! '

তাই আনোয়ার চায় ইসলাম ধর্মের জাগরণ। ছালেহা শুধু তার এই আদর্শের বক্তৃতা শোনবার পাত্রীমাত্র। ছালেহা আনোয়ারের কথাবার্তা শুনতে শুনতে কখনো কখনো কেঁদে ওঠে — ' আনোয়ারের কণ্ঠ শেষের দিকে কোমল ও সজল হয়ে এসেছিল যেন ঝড় থেমে এল। সে নীরবে ছালেহার পানে তাকালে,

তাকিয়ে দেখলে তার অশ্রু-সজল চোখ বেয়ে পানি ঝরছেহ্ন সে কাঁদছে। আনোয়ার কিছু বললে না। ' ছালেহার চোখে জল ঝরে পড়ে কারণ সে বুঝতে পারে আনোয়ার কি চায়। আানোয়ারের কাছে বসে থাকলে, তার ' সুন্দর বড় বড় চোখ দুটি প্রশান্ত ও গভীর, আর ঠোঁটের পাশে কোমল রেখা ' দেখলে, তার আদর্শের বুলি শুনলে ছালেহার জীবনযন্ত্রণা আরও বেড়ে যাবে, তাই সে একসময় আনোয়ারকে দূরে ঠেলে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে পৌঁছে যায় নিজের ঠিকানায় — ' সে যেন জোর করে নিজেকে তুলে দাঁড় করালে, তারপর চৈত্রের দুপুরের উত্তপ্ত নিস্তব্ধতার মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে নিঃশব্দ-চরণে সে চলে গেল, কতটা ব্যাথা বুকে করে বয়ে নিয়ে গেল, জানা গেল না। '

সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহের ছোটগল্পে নারীর চোখে স্তব্ধতা, শূন্যতা, সজলতা, স্বপ্নাবিষ্টতা, বিরক্তি, বিস্ময়, কৃতজ্ঞতা, চাঞ্চল্য, উদ্-ভ্রান্তি — এইসব বিচিত্রভাব খেলা করেছে। এছাড়া শুধু মেয়েদের ভূমিকা পালন, তার বদ্ধতা, তার বেদনাকাতরতা, তার জীবনযন্ত্রাণায় নয়, সেইসঙ্গে গল্পকার নারীমুক্তি ইঙ্গিতের দিশাও দেখিয়ে দিয়েছেন।

গ্রন্থপঞ্জিঃ-

[১] সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র উপন্যাস/শওকত আলী হ্য নিরন্তরহ্ন নাঈম হাসান সম্পাদিতহ্য শ্রাবণ ১৩৯২, ঢাকা।

[২] ভট্টাচার্যদেবীপদ, ' সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র উপন্যাসহ্য দ্বিতীয় চিন্তা ' , ভাষা – সাহিত্যপত্র , ১৩৮৫।

[৩] ফুয়াদআফিফ (সম্পাদক), দিবা রাত্রির কাব্য পত্রিকা ,সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সংখ্যা , কথাসাহিত্য ও কথাসাহিত্য বিষয়ক ত্রৈমাসিক, ও এপ্রিল-জুন ২০০৮, ষষ্ঠদশ বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা , জানুয়ারী-মার্চ।